গেরিলা ওয়ার

মজলুম মানুষের লড়াই

গেরিলা ওয়ার

রবার্ট টেবার

ফাউন্টেন
পা ব লি কে শ ন্স

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ॥ ৭
মুখবন্ধ ॥ ৯

প্রথম অধ্যায়
বিপ্লবের হাওয়া। কৌশলের মূল চাবিকাঠি হিসেবে জনগণের ইচ্ছা। ধনী আর গরিবের সংঘাত। কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বা বিদ্রোহ দমনের ভুল ধারণাগুলো। রাজনীতির আরেক রূপ হিসেবে গেরিলা যুদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্রের বর্মে ফাটল। ॥ **১৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়
দ্য ওয়ার অফ দ্য ফ্লি। রাজনৈতিক আর সামরিক লক্ষ্য। ভেঙে পড়ার মতো একটা পরিবেশ তৈরি করা। বিদ্রোহী বাহিনীর সংগঠন। গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে গুয়েভারার কথা। ॥ **২৯**

তৃতীয় অধ্যায়
ইনসার্জেন্সির শুরু এবং তার বিবর্তন। গৃহযুদ্ধে রূপান্তর। বিকল্প সমাধান। দ্য কিউবান এক্সাম্পল। ॥ **৩৭**

চতুর্থ অধ্যায়
দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ। সাধারণ মানুষ বনাম নিয়মিত সেনাবাহিনী। ধর্মপ্রচারক হিসেবে গেরিলা। দ্য ওয়ার অব দ্য ফ্লি-তে মাও সে-তুং। চীনের শিক্ষা। ॥ **৫২**

পঞ্চম অধ্যায়
উপনিবেশিক যুদ্ধ আর ফরাসিদের অভিজ্ঞতা। ভো নগুয়েন জিয়াপের রণকৌশল। ইন্দোচীনে ভিয়েতমিনরা কীভাবে জিতেছিল। ॥ **৭১**

ষষ্ঠ অধ্যায়

দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধের রাজনৈতিক চরিত্র। আমেরিকানদের ভূমিকা। যুদ্ধের বিস্তার। দ্য আউটলুক। ॥ **৯০**

সপ্তম অধ্যায়

জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ আর তার চড়া মূল্য। আইরিশদের 'ট্রাবল্স' আর ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যানদের ভূমিকা। উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহ। ॥ **১০২**

অষ্টম অধ্যায়

সাইপ্রাসে গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে জেনারেল গ্রিভাস। সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক ব্যবহার। ব্রিটিশ কৌশলের ভুলগুলো। ॥ **১১৯**

নবম অধ্যায়

দ্য ওয়ার অফ দ্য ফ্লি এর ব্যর্থতাগুলো। ফিলিপাইনে ম্যাগসাইসাই আর হুক বিদ্রোহীরা। মালয়েশিয়ায় ব্রিটিশদের বিজয়ের দাম। গ্রীসে কমিউনিস্টরা কেন হেরেছিল। ॥ **১৩৬**

দশম অধ্যায়

দ্য আর্ট অফ ওয়ার নিয়ে সান জু। গেরিলা কৌশল আর রণকৌশলের মূলনীতি। নির্ধারক হিসেবে ভূখণ্ড। শহুরে এলাকায় গেরিলা যুদ্ধ। একজন গেরিলার চরিত্র। ॥ **১৫১**

একাদশ অধ্যায়

তৃতীয় বিশ্বে গেরিলা আন্দোলন। বিপ্লবী ভিত্তি। আমেরিকার জন্য আউটলুক। লাতিন আমেরিকায় আমেরিকার নতুন পররাষ্ট্রনীতির প্রস্তাব। ॥ **১৭৭**

প্রকাশকের কথা

কিছু বই সময়ের সীমা অতিক্রম করে—তারা কেবল একটি বিষয়ের আলোচনা নয়, বরং একটি যুগের চিন্তা, সংগ্রাম ও বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। রবার্ট টেবার -এর দ্য ওয়ার অফ দ্য ফ্লি তেমনই এক অনন্য গ্রন্থ, যা গেরিলা যুদ্ধকে কেবল সামরিক কৌশল হিসেবে নয়, বরং একটি গভীর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিশ্লেষণ করে। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে সহজতার খাতিরে আমরা বইটির জন্য 'গেরিলা ওয়ার' নামটিই গ্রহণ করেছি।

এই বইটি এমন এক প্রেক্ষাপটে রচিত, যখন বিশ্বজুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিরোধ সংগ্রাম এক নতুন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময়ের আবেগ, আশা, বিভ্রান্তি ও বাস্তবতার জটিল মিশ্রণকে টেবার অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—গেরিলা যুদ্ধ মূলত দুর্বলদের শক্তিশালীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক অভিনব কৌশল, যেখানে বিজয়ের চাবিকাঠি অস্ত্রের শক্তিতে নয়, বরং মানুষের সমর্থন, ধৈর্য এবং কৌশলগত প্রজ্ঞায় নিহিত।

টেবারের সবচেয়ে বড় অবদান হলো, তিনি গেরিলা যুদ্ধকে রোমান্টিক আবেগের মোড়ক থেকে বের করে এনে তার বাস্তব ও কার্যকর কাঠামোটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন—কেন অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল গেরিলা বাহিনী শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সামরিক শক্তিকে বিপাকে ফেলে দিতে পারে, এবং কীভাবে এই ধরনের যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। একই সাথে তিনি সতর্ক করেছেন—এই পথের সীমাবদ্ধতা, ভুল ধারণা এবং অতিরঞ্জিত প্রত্যাশা সম্পর্কেও।

এই গ্রন্থের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর বিশ্লেষণধর্মী গভীরতা। টেবার কেবল ঘটনাবলি বর্ণনা করেননি; বরং তিনি সেই ঘটনাগুলোর অন্তর্নিহিত কারণ, কাঠামো এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে পাঠক এখানে শুধু ইতিহাস জানেন না—বরং ইতিহাসের ভেতরের যুক্তি ও প্রবাহকেও বুঝতে পারেন।

বাংলা ভাষায় এই ঐতিহাসিক বইটি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা একটি সচেতন পন্থা অনুসরণ করেছি। আমরা কেবল আক্ষরিক অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিনি; বরং মূল গ্রন্থের ভাব, প্রবাহ এবং বোধকে অক্ষুণ্ণ রেখে ভাবানুবাদের একটি প্রাঞ্জল রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই কারণে, একে শুধু অনুবাদ না বলে—মূল বইয়ের অবলম্বনে নির্মিত একটি পাঠযোগ্য ও বোধগম্য সংস্করণ বলাই অধিকতর যথাযথ।

আমাদের বিশ্বাস, গেরিলা ওয়ার কেবল গবেষক বা রাজনীতি বিশ্লেষকদের জন্য নয়; বরং যে কোনো সচেতন পাঠকের জন্য এটি এক গভীর চিন্তার দ্বার উন্মোচন করবে। কারণ, এই বই শেষ পর্যন্ত আমাদের এমন এক মৌলিক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়—ক্ষমতা, প্রতিরোধ এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রকৃত সম্পর্ক আসলে কী? এই গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার উপকরণ—যা তাকে কেবল অতীত বুঝতে নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়েও নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করবে।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০৬-০৪-২৬

মুখবন্ধ

ষাটের দশকের শেষের দিকের কথা। 'ওয়ার অফ দ্য ফ্লি' বইটি যখন সর্বপ্রথম আলোর মুখ দেখল, সারা বিশ্বের চরমপন্থী রাজনীতির অন্দরমহলে তখন একটা বিষয় নিয়ে বেশ মাতামাতি। সমাজের গরিব আর বঞ্চিত মানুষদের হয়ে গেরিলা বাহিনীর এই বিপ্লবী যুদ্ধ তখন রীতিমতো ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দোচীনের ঘন জঙ্গল থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের উন্মুক্ত প্রান্তর—সব জায়গার বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মনে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল। তারা ভাবতে শুরু করেছিলেন, এতকাল পরে গরিব মানুষ অবশেষে এমন এক জাদুকরী পথ খুঁজে পেয়েছে, যা দিয়ে ধনী আর ক্ষমতাধরদের একেবারে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া যাবে। আর এভাবেই শুরু হবে এক নতুন সমতাভিত্তিক রাজনৈতিক যুগ।

এই পুরো ব্যাপারের পেছনে মূল প্রেরণা আর গতিটা এসেছিল মাও সে তুং এর ভাবনা থেকে। তিনি একেবারে চমৎকার এক ছক কষেছিলেন, আর সেটা সফলভাবে কাজেও লাগিয়েছিলেন। তার ব্যাপারটা ছিল একটা দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ। মূলত গ্রামের দিকে, সাধারণ মানুষের বিশাল আর সুসংগঠিত সমর্থন নিয়ে গেরিলা যুদ্ধ চালানোই ছিল তার মূল মন্ত্র।

মাও এর এই চোখ ধাঁধানো সাফল্য দেখে চুপ করে থাকেনি ভিয়েতমিনরা। চল্লিশের দশকের শেষে আর পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে ফরাসিদের বিপক্ষে তারা একদম একই কায়দায় সফলভাবে লড়েছিল। এর এক দশকের সামান্য কিছু সময় পর ভিয়েত কংরাও একই পথে হাঁটে। মাওয়ের সেই নীলনকশা ধরে এগিয়ে তারা দক্ষিণ ভিয়েতনাম আর আমেরিকানদের হারিয়ে বিজয়ের স্বাদ নেওয়ার একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল। সাইপ্রাস আর ফিলিস্তিনে অতীতের সেই বিপ্লবী বিজয়, সাথে আলজেরিয়া আর কিউবার একদম তরতাজা সাফল্য—সবকিছু মিলিয়ে এই দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের কৌশল নিয়ে মানুষের আত্মবিশ্বাস আর কাজের গতি

একেবারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। অনেকেই মন থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করল, এই পথ ধরেই এক নতুন প্রগতিশীল যুগের সূচনা হবে।

রবার্ট টেবার যে এই ঘটনাপ্রবাহ আর এর চারপাশের রোমান্টিসিজমের জোয়ারে পুরোপুরি ভেসে গিয়েছিলেন, তা খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ নিয়ে তার কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী কিছুটা অতিরঞ্জিত আর টেকসই না হলেও, দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের ধরন নিয়ে তার যে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ ছিল—তা একেবারে নিখুঁত। এই যুদ্ধগুলো কেন জিতত, তার যে কারণ তিনি দেখিয়েছিলেন, তা আজকের দিনেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। একুশ শতকের শুরুর দিকে এসেও তার এই কাজের সবচেয়ে বড় মূল্য ঠিক এখানেই নিহিত।

খুব স্বাভাবিকভাবেই, টেবারের এই বইটা যখন প্রথম বাজারে এসেছিল, তারপর থেকে দুনিয়ার অনেক কিছুই পাল্টে গেছে।

এর মধ্যে দুটো বিষয় আলাদা করে বলতেই হয়। প্রথমত—এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—আমাদের বিশ্লেষণের ধারণাগুলো এখন আগের চেয়ে অনেক বিস্তৃত ও পরিশীলিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্লোবালাইজেশনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তাই টেবারের এই বইটিকে যদি আমরা এমনভাবে উপস্থাপন করতে চাই— যাতে এটি আমাদের জন্য কার্যকর হয়, সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং আমাদের আকৃষ্ট করে রাখে— তাহলে এই দুইটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিশ্লেষণের ধারণার কথা যদি ধরি, জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত আর মাঠে কাজ করা মানুষেরা ইনসার্জেন্সি, রেভল্যুশনারি ওয়ারফেয়ার, গেরিলা ওয়ারফেয়ার আর টেররিজমের মতো শব্দগুলোর জট ছাড়িয়েছেন। আগের সেই সাদামাটা দিনগুলোতে এই শব্দগুলোকে একটার বদলে আরেকটা অনায়াসে ব্যবহার করা হতো। এখন ইনসার্জেন্সি বা ভেতরের যুদ্ধকে একটা বিশাল ছাতার মতো দেখা হয়। এর মানে হলো, সরকার আর বাইরের কোনো দল বা বিরোধীদের মধ্যে একটা লড়াই। এই লড়াইয়ে বিরোধীরা রাজনৈতিক জোর আর সংঘাত— দুটোই ব্যবহার করে রাজনীতির চারটে মূল বিষয়ের কোনো একটা বা কয়েকটাকে বদলাতে, নতুন করে সাজাতে বা টিকিয়ে রাখতে চায়। সেই চারটে বিষয় কী কী? এক, দেশের সীমানার অখণ্ডতা আর রাষ্ট্র কীভাবে তৈরি সেটা। দুই, পলিটিক্যাল সিস্টেম বা রাজনৈতিক ব্যবস্থা। তিন, ক্ষমতায় বসে থাকা লোকজন। আর চার, সমাজের কে কী পাবে

সেটা ঠিক করে দেওয়া নীতি। এখন প্রশ্ন হলো, কোন ঘটনায় কোন বিষয়গুলো খাটবে। এর উত্তর একেক জায়গায় একেক রকম। শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগার আর পশ্চিম সাহারার পলিসারিওর মতো কিছু ইনসার্জেন্ট বা বিদ্রোহীরা চায় নিজেদের আলাদা দেশ বানাতে। আবার কলম্বিয়ার ফার্ক বা আলজেরিয়ার আর্মড ইসলামিক গ্রুপের মতো দলগুলোর চোখ থাকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আর ক্ষমতাবানদের হটিয়ে নিজেদের পছন্দের কাউকে বসানোর দিকে। উল্টো দিকে আবার উত্তর আয়ারল্যান্ডের আলস্টার ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো কিছু দল লড়াই করে রাজনীতির এই চারটে দিক, বিশেষ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত শোনালেও সত্যি।

বিদ্রোহীদের আসল লক্ষ্য বা শেষ গন্তব্যটাও কিন্তু একেক দলের একেক রকম হয়। কেউ চায় নতুন স্বাধীন দেশ গড়তে, কেউ চায় সমাজে সবার সমান অধিকার, কেউ আবার ধর্মীয় আইনের ওপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা দাঁড় করাতে চায়। বহুদলীয় গণতন্ত্র কিংবা বর্তমান ব্যবস্থাতেই সম্পদের সমান ভাগাভাগিও অনেকের লক্ষ্য থাকে। আবার যেমনটা আগে বললাম, অনেকেই চায় সবকিছু যেমন চলছে তেমনই চলুক। এই শেষের কথাটাই পরিষ্কার করে দেয়—সব ইনসার্জেন্সিই আসলে বিপ্লবী নয়। আর যেগুলো বিপ্লবী, তাদেরও একেকজনের আসল লক্ষ্য থাকে একেক রকম। খুব সোজা কথায়, ইনসার্জেন্সি নিয়ে আমাদের এখনকার এই বিশাল ভাবনা ষাটের দশকের শেষের সেই ধারণাকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। তখন তো সব বিদ্রোহীকেই এমন বিপ্লবী মনে করা হতো, যারা কিনা সমাজ আর রাজনীতিকে একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে চায়।

টেররিজম বা সন্ত্রাসবাদকে গেরিলা যুদ্ধ থেকে আলাদা করে দেখার কারণে ইনসার্জেন্সির বিশ্লেষণ আরও অনেক বেশি ধারালো হয়েছে। বলার ধরনে সামান্য এদিক ওদিক থাকলেও বেশিরভাগ বিশ্লেষক টেররিজমকে এমন একটা জিনিস হিসেবে দেখেন—যেখানে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য সাধারণ মানুষের মনে ভয় ঢোকাতে তাদের ওপর শারীরিক জোর খাটানো হয় বা জোর খাটানোর ভয় দেখানো হয়। অন্যদিকে, গেরিলা যুদ্ধ হলো পুলিশ, মিলিটারি আর তাদের সাহায্য করা কাঠামোগুলোর ওপর আচমকা হামলা করে আবার পালিয়ে যাওয়া। হিট অ্যান্ড রান আর কী! বিদ্রোহীরা এই দুই ধরনের যুদ্ধের যেকোনো একটা বেছে নিতে পারে, আবার দুটোই একসাথে চালাতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা একেবারে সাধারণ সেনাদের মতো দল বেঁধে কনভেনশনাল বা গতানুগতিক আক্রমণ করার পথেও হাঁটে।

কৌশল বেছে নেওয়ার বেলাতেও বিদ্রোহীদের মধ্যে বেশ তফাত দেখা যায়। সবাই যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের কৌশল পছন্দ করে—তা কিন্তু নয়। সত্যি বলতে, অনেকেই রাজনৈতিক সংগঠন আর সাধারণ মানুষের সমর্থনের চেয়ে মিলিটারির ওপর জোর দেওয়া কৌশলকে বেশি জোর দেয়। আবার কেউ কেউ বেছে নেয় ছোট আকারের গোপন ষড়যন্ত্র কিংবা একেবারে শহরের ভেতরের যুদ্ধ বা আর্বান ওয়ারফেয়ার। তবে তারা নিজেদের কৌশল কতটা মন দিয়ে মেনে চলে আর তার দরকারি জিনিসগুলো কতটা মেটাতে পারে, সেটা একেবারে ভিন্ন এক আলাপ। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে গ্রিসে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদের ব্যর্থতা নিয়ে টেবারের যে দারুণ গভীর মূল্যায়ন, সেখানেই এই ব্যাপারটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

এখন বেশ ভালোভাবেই এই প্রশ্ন তোলা যায়, এই বিশাল বিশ্লেষণ আর হিসাব নিকাশের ভেতরে 'দ্য ওয়ার অফ দ্য ফ্লি' বইটি ঠিক কোথায় খাপ খায়। অন্যভাবে বললে, আজকের দিনে এর কাজ কী? আমার মনে হয় এর দুটো খুব ইতিবাচক উত্তর আছে। প্রথম কথা, টেবার অত্যন্ত পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত, তথ্যবহুল আর বেশ আবেগের সাথে যে ধরনের ইনসার্জেন্সি নিয়ে কথা বলেছেন, সেগুলো আজও আমাদের আশেপাশে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিলিপিন্সের নিউ পিপলস আর্মি আর একটু আগে বলা সেই ফার্ক এর জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। বইটার তিন থেকে নয় নম্বর অধ্যায়ে এই ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট। তাছাড়া, গ্লোবালাইজেশনের কারণে দেশে দেশে আর দেশের ভেতরে যে বৈষম্য হুহু করে বাড়ছে—তার হাত ধরে এমন নতুন বিদ্রোহীদের জন্ম হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর তারা এই দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ আর এর পেছনের সব কৌশলকে বুকে টেনে নেবে। যদি এমনটা সত্যিই ঘটে, তবে এই কৌশলের ভেতরের হিসাব নিকাশ, অনুমান, জয় আর পরাজয়কে আমাদের নতুন করে বুঝতে হবে। ঠিক এই জায়গাটাতেই টেবারের গভীর জ্ঞান আমাদের জন্য এক অমূল্য রতন হয়ে উঠবে।

টেবার এখানে পাঁচটা বিষয়ের কথা বলেছেন যা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এক, বঞ্চনার বোধ আর সশস্ত্র লড়াই দিয়ে সেটাকে শোধরানোর বিশ্বাস কীভাবে মানুষের ভেতরে বিদ্রোহ করার ইচ্ছাকে জন্ম দেয় আর সেটাকে বাঁচিয়ে রাখে। দুই, একটা অত্যন্ত গোছানো আর কৌশলী মানসিকতা, যার কাজ হলো শত্রুর শক্ত দিকটাকে এড়িয়ে গিয়ে তাদের দুর্বল জায়গায় আঘাত করা। আর এই কাজটা করে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা গেরিলা দলগুলো অসংখ্য ছোট ছোট হামলার মাধ্যমে। তিন নম্বর হলো, দীর্ঘস্থায়ী সশস্ত্র লড়াইয়ের রূপ বদলানোর ব্যাপারটা। শুরু হয় আত্মরক্ষা দিয়ে,

তারপর আসে এক ধরনের অচলাবস্থা, আর শেষে আসে সরাসরি আক্রমণ। চার নম্বর হলো, রাজনৈতিক সংগঠন আর তাদের ঘাঁটিগুলো কীভাবে একটা লড়াইয়ে প্রাণশক্তি জোগায় আর সেটাকে টিকিয়ে রাখে। আর পাঁচ নম্বর, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জরুরি বিষয়—ইনসার্জেন্টদের এই চ্যালেঞ্জের জবাবে সরকার ঠিক কী করে। কারণ, সাধারণ মানুষের ওপর বাছবিচার ছাড়া অতিরিক্ত সংঘাত চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে ওঠার ব্যাপারে সরকারের একটা অদ্ভুত আর অসামান্য প্রতিভা থাকে।

টেবারের আমলের বিদ্রোহী আন্দোলনগুলোর চেয়ে আজকের দিনের সংঘাতগুলোর আদর্শিক চেহারা একেবারেই ভিন্ন। তবুও, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে টেবারের আলোচনা আজকের দিনের সেই সংঘাতগুলোতেও দারুণভাবে আলো ফেলতে পারে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নব্বইয়ের দশকে দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ গেরিলাদের হাতে ইসরায়েলিদের সেই বিশাল পরাজয়ের কথা ধরুন। কিংবা পশ্চিম তীরের বিশাল অংশ আর গাজা উপত্যকায় বিচ্ছিন্ন বসতিগুলো দখল করে রাখার কারণে ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরায়েলের যে সংঘাত— তার ভবিষ্যৎ পরিণতিই বা কী হতে পারে! সত্যিই, দশকের পর দশক পেরিয়ে আসা একটা পরিচিত সুর টেবারের অনেক কথার ভেতরেই মিশে আছে। ২০০২ সালের ৫ এপ্রিল ইসরায়েলের সবচেয়ে নামকরা খবরের কাগজ হারেৎজ—এ জিভ স্টার্নহেলের নিচের কথাগুলোতে সেই সুরটা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

‘সেই দশ বছর আগেই, ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সেসের জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিল। তারা বলেছিল, ওই এলাকাগুলোতে যে অভ্যুত্থান চলছে, তার কোনো মিলিটারি সমাধান নেই। সত্যি বলতে, ওই মানুষগুলোর মানসিকতা আর বর্তমান সরকার ও চিফ অফ স্টাফ প্রতিদিন যে ভয়ংকর রকমের সরলীকরণ করে চলেছেন, এই দুটোর মাঝে আলোকবর্ষের দূরত্ব।

গত শতাব্দীতে দখলদার সেনাবাহিনীগুলো সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে জোর খাটানোর যত রকম পুরনো আর সেকেলে কৌশল ছিল, সবই প্রয়োগ করে দেখেছে। ফল সবসময় একই হয়েছে। জনগণের সমর্থন পাওয়া গেরিলা যোদ্ধারা খুব সহজেই একটা ভারী আর বোকা সেনাবাহিনীকে এমন সব কাজে জড়িয়ে ফেলতে পারে—যা মানুষের মনে আরও বেশি ঘৃণা উসকে দেয়। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে, অত্যাচারের মাত্রা যত বেড়েছে, প্রতিরোধের আগুন তত বেশি জ্বলে উঠেছে।

দিন শেষে, রাজনৈতিক জয়টা ওই গেরিলাদেরই হয়, কারণ যারা নিজেদের

স্বাধীনতার জন্য লড়ে, তারা শেষমেশ তাদের লক্ষ্য পূরণ করেই ছাড়ে। অপমানিত আর ধুলোয় মিশে যাওয়া মানুষগুলো আবার ছাই থেকে উঠে দাঁড়ায়। কেবল কোনো অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই ভাবতে পারে যে, ওই জায়গাগুলো দখল করে রাখলে গেরিলা যুদ্ধ আর সন্ত্রাসবাদের ইতি টানা যাবে। বরং একদিকে এটা ভাবাই বেশি যুক্তিসঙ্গত যে—এই সন্ত্রাসবাদ আরও বাড়বে, আরও নিখুঁত আর ধ্বংসাত্মক রূপ নেবে। অন্যদিকে, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর বিরুদ্ধে এই গেরিলা যুদ্ধ, তাদের বিশাল সৈন্য সমাবেশের কারণেই, একটা সর্বাত্মক জনযুদ্ধের আকার নেবে। আর শেষমেশ এটা একটা মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে ছাড়বে।’

এখানে উদ্দেশ্য কিন্তু ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বে কোনো এক পক্ষ নেওয়া নয়। বরং এটা দেখানো যে, টেবার যে ধরনের ধারণা আর প্রস্তাবনাগুলোর কথা বলেছিলেন, সেগুলো আমাদের আজকের দুনিয়াতেও দিব্যি বেঁচে আছে। বর্তমানের সংঘাতগুলো বিশ্লেষণ করতে আর তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা পেতে এই কথাগুলো আমাদের দারুণ কাজে লাগতে পারে।

নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার বাইরে গিয়েও, ষাটের দশকের শেষের দিক থেকে ইনসার্জেন্সি বা ভেতরের যুদ্ধের ধরনে কী কী বদল এসেছে—তা নিয়ে একটা বড়সড় আলোচনার ভিত গড়ে দিতে পারে টেবারের এই বইটা। এখানে আমরা ভাবতে পারি, কোন কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক বদলগুলো টেবারের সেই প্রত্যাশিত জায়গাগুলোতে বিপ্লবের আগুন নিভিয়ে দিয়েছিল। বিশেষ করে লাতিন আমেরিকা আর আমেরিকার কথা তো বলতেই হয়, যেখানে তিনি বিপ্লবের আশা করেছিলেন। টেবার যে মার্ক্সবাদী আর সমতাবাদী বিপ্লবের কথা লিখেছিলেন, তার চেয়ে একেবারে আলাদা কোনো উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের কৌশল কাজে লাগানোর সুযোগ আর সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়েও আমরা হিসাব-নিকাশ করতে পারি। কিন্তু এই ধরনের বিশ্লেষণ যদি সত্যিই বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কাজে লাগাতে হয়, তবে দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধ সম্পর্কে টেবারের দ্য ওয়ার অফ দ্য ফ্লি বইয়ে যেমন নিখুঁত, জ্ঞানগর্ভ আর স্পষ্ট ধারণা দেওয়া আছে, ঠিক তেমন একটা মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে।

বার্ড ই ও’নিল
ওয়াশিংটন ডিসি

প্রথম অধ্যায়

বিপ্লবের হাওয়া। কৌশলের মূল চাবিকাঠি হিসেবে জনগণের ইচ্ছা। ধনী আর গরিবের সংঘাত। কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বা বিদ্রোহ দমনের ভুল ধারণাগুলো। রাজনীতির আরেক রূপ হিসেবে গেরিলা যুদ্ধ। আধুনিক রাষ্ট্রের বর্মে ফাটল।

কমিউনিস্টদের দখলে থাকা বেন ক্যাট এলাকার ওপর দিয়ে উড়ে গেল যুদ্ধের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হেলিকপ্টার বহর। ৯৬টা হেলিকপ্টারে করে রকেট, মেশিনগান আর ১,০০০ জন হামলাকারী সেনা। তাদের সাথে ৪,০০০ পদাতিক সেনা, রেঞ্জার আর কাউন্টার-গেরিলা স্কোয়াড। এই বিশাল বাহিনীর লক্ষ্য ছিল প্রায় ১,৫০০ থেকে ২,০০০ ভিয়েত কং সেনাকে ঘিরে ফেলা। এই ভিয়েত কংরাই দুই সপ্তাহ আগে খুব নিখুঁতভাবে ফাঁদ পেতে সরকারি বাহিনীর চারটে ব্যাটালিয়নকে একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল।

এই বিশাল অভিযানের খবরটা ছিল যুদ্ধের সবচেয়ে ফাঁস হয়ে যাওয়া গোপন খবরগুলোর একটা। সায়গনে সরকারি তথ্য কর্মকর্তারা কয়েকদিন আগেই ফটোগ্রাফারদের খবর দিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু যখন ওই বিশাল বাহিনী বেন ক্যাটে গিয়ে নামল, ততক্ষণে বেশিরভাগ ভিয়েত কংই সেখান থেকে সটকে পড়েছে।

- টাইম, ২১ আগস্ট, ১৯৬৪

দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুটো রেঞ্জার কোম্পানি সায়গনের ২৫ মাইল উত্তরে সমতল ঘাসজমি আর ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। কমিউনিস্ট ভিয়েত কং গেরিলাদের হামলার মুখে পড়া একটা ফাঁড়িকে সাহায্য করার জন্য তাদের এই রুটিন মিশন। ২০০ জন সৈন্য খুব সাবধানে এগোচ্ছিল। রাবার গাছের একটা বাগানে তারা একটু জিরিয়ে নিল, তারপর একটা খোলা মাঠে বেরিয়ে এসে ৪০০ গজ দূরের একদল কুঁড়েঘরের দিকে এগোতে লাগল।

হঠাৎ করেই চারপাশ থেকে গুলির কানফাটানো আওয়াজ আর বৃষ্টির মতো গুলি ধেয়ে আসতে শুরু করে। শব্দটা কানে আসার আগেই অনেকে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাকিরা যে যার মতো ছুটতে শুরু করল। তাদের শক্তপোক্ত আমেরিকান উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট উইলিয়াম রিক্টার স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুখ তুলেই তিনি দেখলেন, সবুজ পোশাক পরা ভিয়েত কং সেনারা তাদের মারার জন্য এগিয়ে আসছে। রিক্টার লাফিয়ে উঠে বাঁচার জন্য দৌড় লাগালেন। কিন্তু মাঠের এক কোণায় লুকিয়ে ছিল ভিয়েত কং স্নাইপার।

সহসাই তার ঊরুতে একটি গুলি আঘাত হানলে তিনি আবারও পড়ে যান। তারপর তিনি হামাগুড়ি দিয়ে পাশের ঝোপের আড়ালে লুকান, আর কোনোমতে এগোতে থাকেন। টানা ছয় ঘণ্টা ধরে, বেঁচে যাওয়া অন্য সেনাদের সাহায্যে, তিনি নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিজের ঘাঁটি বিন মি তে ফিরে আসেন। তার কপালটা ভালো ছিল। কারণ রাবার বাগানের ওপাশের সেই মাঠে তখন ৫১ জন রেঞ্জার সেনা মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল।

‘ওরা স্রেফ আমাদের একটা ফাঁদে ফেলেছিল, তারপর পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমাদের একেবারে কুপোকাত করে ফেলে,’ পরে এভাবেই রিক্টার পুরো ঘটনাটার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ‘আমরা একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা খেয়েছিলাম আর ওরা আমাদের টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল।’

‘সেই একই ফালতু গল্প,’ সায়গনে বসে একজন সিনিয়র আমেরিকান অফিসার বিরক্তি নিয়ে বিড়বিড় করে বলেন।

‘ভিয়েতনামে প্রতি সপ্তাহে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। শুধু ধরন আর মাত্রাটা একটু এদিক ওদিক হয়। ঘাঁটিতে হামলা হচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তাদের খুন করা হচ্ছে, গ্রামে আগুন জ্বলছে, আর শহরে চলছে আক্রমণ। সবকিছু মিলিয়ে একটাই হতাশাজনক উপসংহার টানা যায়: অস্ত্র আর সৈন্যে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সেই বাহিনীকে রীতিমতো নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে, যাদের সৈন্য সংখ্যা ৪ লক্ষের বেশি, সাথে আছে ১৭ হাজার আমেরিকান উপদেষ্টা আর আমেরিকার তরফ থেকে প্রতিদিন আসা প্রায় ২০ লাখ ডলারের সাহায্য।’

- স্ট্যানলি কার্নো, ‘দিস ইজ আওয়ার এনিমি’, স্যাটারডে ইভনিং পোস্ট, ২২ আগস্ট, ১৯৬৪

এটাই হলো গেরিলা যুদ্ধ। সেই গুয়েরা দে গুয়েরিলাস—যা স্প্যানিশ বিদ্রোহীরা নেপোলিয়নের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিল। আমাদের যুগে এসে এটা একটা সামরিক আর রাজনৈতিক আধা-বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এর এক অংশে আছে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী সমাজতত্ত্ব, আর অন্য অংশে যুদ্ধের কৌশলে নতুনত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের পৃথিবীতে এই যুদ্ধটাই ক্ষমতার হিসাব নিকাশ পাল্টে দিয়েছে। আর এই প্রক্রিয়ায় পশ্চিমা সামরিক কর্তাদের সেই পুরনো সব বিশ্বাস ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, যাদের মূল কাজই হলো এই যুদ্ধটাকে উপলব্ধি করে এর মোকাবিলা করা।

গেরিলা যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এটা বিপ্লবের সেই হাওয়া, যা তিন মহাদেশ জুড়ে আশা আর ভয় দুটোই ছড়িয়ে দেয়। এই লেখাটা যখন লিখছি, তখন অ্যাঙ্গোলা থেকে শুরু করে ইরাক, কঙ্গোর জঙ্গল থেকে কারাকাসের বস্তি, এমন অনেক দেশেই এই যুদ্ধ চলছে। ভিয়েতনামে আমেরিকার জড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এটা পেন্টাগন, সিআইএ, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল আর হোয়াইট হাউসের সবচেয়ে বড় মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই গোলার্ধেও গুয়াতেমালা, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়ায় নিঃশব্দে এক মরিয়া লড়াই চলছে। এমনকি খোদ আমেরিকাতেও এটা ছড়িয়ে পড়ার একটা নীরব হুমকি আছে। হার্লেম থেকে শুরু করে ডিপ সাউথের কৃষ্ণাঙ্গ চরমপন্থীদের চিন্তাধারায় এর প্রভাব যে আছে, তা তো স্পষ্ট। কিছুদিন আগে শহরের রাস্তাকে গ্রাস কেয়া পেট্রোল বোমাই তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ।

পুরো দুনিয়া জুড়ে, যেখানে যেখানে সামন্তবাদ আর পুরনো উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্নগুলো টিকে আছে, এই যুদ্ধ সেগুলোকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এখন এর পুরো জোরটা গিয়ে পড়ছে নয়া-উপনিবেশবাদ আর মার্ক্সবাদীদের ভাষায় যাকে বলে ‘সাম্রাজ্যবাদ’-এর ওপর। সাম্রাজ্যবাদ মানে হলো ধনী, ক্ষমতাবান আর প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকা দেশগুলো যখন প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকা, গরিব আর দুর্বল দেশগুলোর ওপর অর্থনীতি, রাজনীতি আর কখনো কখনো সামরিক দিক থেকেও ছড়ি ঘোরায়। প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকা এলাকাগুলোতে এই যুদ্ধ সমাজের নিচুতলার সাধারণ মানুষদের অত্যাচারী জমিদার, ব্যবসায়ী, একনায়ক আর সামরিক জান্তাদের হাত থেকে মুক্তি দিচ্ছে। আর এই পুরো প্রক্রিয়ায়—যেমনটা অভিযোগ করা হয় আর যেমনটা হয়তো ঘটেও—তাদের আবার আরেক ধরনের স্বৈরাচারের হাতে তুলে দিচ্ছ। আর সেটা হলো কর্তৃত্ববাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

একদিক থেকে দেখলে, এটা একটা মোক্ষম অস্ত্র, জাতীয় মুক্তি আর সামাজিক ন্যায়ের তলোয়ার। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে, এটা একটা ধ্বংসাত্মক আর অশুভ প্রক্রিয়া। সব মিলিয়ে, এই যুদ্ধ নতুন এক মেরুকরণ আর ক্ষমতার লড়াই তৈরি করছে, যা স্নায়ুযুদ্ধের সাথে গভীরভাবে যুক্ত এবং করো আবার সেটাকে ছাড়িয়েও যায়। এই যুদ্ধ আমাদের চেনা পৃথিবীটাকে নতুন করে গড়ছে। এর ফলাফলই হয়তো ঠিক করে দেবে আমাদের সামনের দিনের ভবিষ্যৎ কেমন হবে। আর সেটা শুধু এখনকার বিশাল আর ছায়াময় যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতেই নয়, বরং সব জায়গায়।

তাহলে প্রশ্ন জাগে: এই যুদ্ধটা আসলে কী? এর সাথে কী করা যায়—বা একে নিয়ে কী করা যায়? একে কীভাবে থামানো যায় বা কীভাবে কাজে লাগানো যায়? এটা কি এমন কোনো কল, যা চাইলেই জাতীয় নীতি বা রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ইচ্ছামতো চালু বা বন্ধ করা যায়?

আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত যে প্রমাণগুলো আছে, তার বেশিরভাগই গত বিশ বছরের মতো একটা সময়ের—যাকে আমরা উপনিবেশ-পরবর্তী যুগ বলতে পারি। এই প্রমাণগুলোর ওপর ভিত্তি করে একটা সংজ্ঞা দাঁড় করানো যায়, যা আমাদের অন্য প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে। আমরা এতক্ষণ ধরে যে বড় পরিসরে আলোচনা করছি, সেখানে গেরিলা যুদ্ধ হলো একটা বিপ্লবী যুদ্ধ। এই যুদ্ধে কোনো দেশের সাধারণ মানুষ বা অন্তত তাদের একটা বড় অংশ, প্রতিষ্ঠিত বা জবরদখলকারী সরকারের সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে।

পরিস্থিতি একেক জায়গায় একেক রকম হতে পারে। যেমন ধরুন, ইসরায়েল বা আলজেরিয়ার কথা। সেখানে শাসনক্ষমতায় ছিল বাইরের লোক, মানে উপনিবেশবাদীরা। আর তাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল প্রায় পুরো দেশের মানুষ, যাদের নেতৃত্বে ছিল একদল চরমপন্থী।

আবার দক্ষিণ ভিয়েতনাম বা কিউবার মতো জায়গায় পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। সেখানে হয়তো সরকার নিজেদেরই স্বাধীন দেশেরই। কিন্তু একটা ছোট রাজনৈতিক দল সেই সরকারের নীতি, মতাদর্শ বা বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বিদ্রোহ শুরু করে।

এভাবে দেখলে প্রতিটি ঘটনাই আলাদা। ভিয়েত কংদের যুদ্ধ যেমন একদিকে আদর্শগত আর গভীরভাবে শ্রেণীবৈষম্য নিয়ে, তেমনি আবার খুব জোরালোভাবে জাতীয়তাবাদীও। এই যুদ্ধের নেতৃত্বে কমিউনিস্টরা থাকলেও, এটা শুধু তাদেরই

টানে না যারা একে দারিদ্র্য আর শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই হিসেবে দেখে। বরং যারা শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ, যারা আর সামরিক একনায়কতন্ত্র মেনে নিতে রাজি নয়—তাদেরও এই যুদ্ধ কাছে টানে। আর সেই সাথে আছে অসংখ্য ভিয়েতনামি জাতীয়তাবাদী (যাদের জায়গায় আমরা থাকলে নিজেদের 'দেশপ্রেমিক' বলতাম)। এরা এই লড়াইকে ফরাসিদের বিরুদ্ধে চলা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক যুদ্ধেরই একটা ধারাবাহিকতা মনে করে, যেখানে ফরাসিদের জায়গা নিয়েছে আরেক দল বিদেশি—অর্থাৎ আমেরিকানরা। তারা স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে একের পর এক ভিয়েতনামের সামরিক জান্তাদের সমর্থন দিচ্ছে আর তাদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধের শেকড় যেখানে আদর্শ আর জাতীয়তাবাদের মাটিতে গাঁথা, সেখানে কিউবার বিপ্লবের এমন দৃশ্যমান কোনো শেকড়ই ছিল না। এর শুরুটা হয়েছিল একটা পুলিশি রাষ্ট্রের দুর্নীতি আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটা ছোট দলের আদর্শিক প্রতিবাদ হিসেবে। এদের রাজনৈতিক অবস্থানটা খুব একটা স্পষ্ট ছিল না—একটু 'উদারপন্থী', একটু সমাজতান্ত্রিক, আর কিছুটা স্প্যানিশ নৈরাজ্যবাদের ছোঁয়া ছিল তাতে। সেখানে কোনো দৃশ্যমান শ্রেণিসংঘাত ছিল না। জাতীয়তাবাদও কোনো বড় ব্যাপার ছিল না। কিউবার বিপ্লবে বিদেশি আর সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের সাথে সংঘাত, আমেরিকাবিরোধী মনোভাব, চরমপন্থী সর্বহারা শ্রেণি আর মার্ক্সবাদী স্লোগানগুলো অনেক পরে এসে জুড়ে বসেছিল। এগুলো বাতিস্তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পথ দেখায়নি। বরং বাতিস্তার পতনের পরেই এসবের জন্ম হয়েছিল।

মরক্কোয় (১৯৫২-১৯৫৬) ইসতিগলাল দলের জাতীয়তাবাদীরা তাদের নির্বাসিত সুলতান মোহাম্মদ সিদি বেন ইউসুফকে প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাদের আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারা দাবিদারকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করে আর ফরাসি প্রটেক্টরেট ভেঙে দেয়। আবার আফ্রিকার অনেক জায়গায় (কঙ্গো, ক্যামেরুন, অ্যাঙ্গোলা) আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর ভেতরের রেষারেষি আর উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলোই যেন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে বেশি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এভাবে জাতীয়তাবাদ, সামাজিক ন্যায়বিচার, বর্ণ, ধর্ম—গত দুই দশকের বিপ্লবগুলোর যে চেনা শ্লোগানগুলো আমরা শুনেছি, তার সবগুলোর নিচেই একটা সাধারণ সুর, একটা মূল প্রেরণা লুকিয়ে আছে। সেটা হলো একটা বিপ্লবী তাড়না, সাধারণ মানুষের ইচ্ছার একটা প্রবল উচ্ছ্বাস। এর সাথে জাতীয় বা জাতিগত পরিচয়, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, সরকারের ধরন, বা সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো রাজনৈতিক

বিদ্রোহের চেনা কথাগুলোর খুব একটা সম্পর্ক নেই। এমনকি অর্থনৈতিক বঞ্চনাও যে সবকিছুর মূলে— সেটাও পুরোপুরি নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ, দারিদ্র্য আর নিপীড়ন তো পৃথিবীর বুকে যুগ যুগ ধরে চলে আসা এমন একটা জিনিস আর মানুষ মুখ বুজেই এসব সহ্য করে আসছে।

বিদ্রোহের যে ইচ্ছা আজ প্রায় সবার মাঝেই দেখা যায়, তা কেবল রাজনৈতিক অবস্থা বা জাগতিক অভাব-অনটনের প্রতিক্রিয়া বলে মনে হয় না। এটা বরং একটা নতুন জেগে ওঠা চেতনার প্রকাশ। মানুষের জীবনের সম্ভাবনাগুলো নিয়ে সচেতনতা যেমন বাড়ছে, তেমনি এই মহাবিশ্বের কার্যকারণ সম্পর্কেও একটা বোধ তৈরি হচ্ছে। এই দুটো জিনিস মিলে প্রথমে মানুষের মনে, তারপর সমাজে আর শেষমেশ পুরো জাতির মধ্যে জীবন নিয়ে একটা একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে।

এই হঠাৎ জেগে ওঠা সচেতনতা আর চেতনার পরিণতি হলো, পৃথিবীর তথাকথিত পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোতে রাতারাতি আমূল পরিবর্তনের এক প্রবল আর জরুরি আকাঙ্ক্ষা তৈরি হওয়া। এর মূলে আছে এক নতুন আর সহজ উপলব্ধি, যা শুনলে অবাক হতে হয়। এই উপলব্ধিটি হলো—যে জীবনকে এতকাল বদলানো যাবে না বলে মনে হতো, তাকে আসলে বদলানো সম্ভব।

যে সীমাবদ্ধতাগুলোকে আগে মানুষ মুখ বুজে মেনে নিত, সেগুলো হঠাৎ করেই অসহ্য হয়ে ওঠে। আসন্ন পরিবর্তনের একটা সামান্য আভাসও এমন সব সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। কিন্তু এসব আগে কেউ ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। এরপরই কাজ করার একটা তাড়না জন্ম নেয়। মনে হয় যেন চারদিকের মানুষ একসাথে বলে উঠছে, ‘দেখো, এটা তো আমরা চাইলেই করতে পারি, পেতে পারি বা হতে পারি। তাহলে আমরা কিসের অপেক্ষায় বসে আছি? চলো, শুরু করি!’

যাই হোক, আধুনিক বিদ্রোহী বা গেরিলা যোদ্ধার মনের অবস্থাটা এমনই। তার স্লোগান বা উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তার আসল আর গোপন অস্ত্রটা কোনো রণকৌশল, কৌশল বা অনিয়মিত যুদ্ধের কায়দা-কানুন নয়। তার আসল অস্ত্র হলো— অন্যের মনে এই একই তাড়না জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা। সামরিক শত্রুকে হারানো বা সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানো, এগুলো পরের কাজ। গেরিলার প্রথম আর প্রধান কাজ হলো সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলা, কারণ তাদের সম্মতি ছাড়া কোনো সরকার একদিনও টিকতে পারে না। একজন গেরিলা বর্তমান ব্যবস্থার জন্য একটা বড় হুমকি। কারণ সে বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেয়। তার কাজগুলো তার

মতাদর্শকে আরও জোরালো করে আর একটা বড়সড় পরিবর্তনের পথ দেখায়। তবে তাকে বিপ্লবের মাটি থেকে আলাদা কেউ ভাবাটা মস্ত ভুল হবে। যে রাজনৈতিক পরিবেশে বিপ্লব সম্ভব হয়, সেই পরিবেশই তাকে তৈরি করে। সে যেমন পরিবর্তনের জন্য সাধারণ মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ, তেমনি সেই পরিবর্তনের অনুঘটকও।

এইটুকু বুঝতে পারলেই দুটো বড় ফাঁদ আর বিভ্রান্তির জায়গা এড়িয়ে চলা যায়, যেগুলোতে কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি বা বিদ্রোহ দমনের বিশেষজ্ঞরা প্রায়ই পা দেন। এর মধ্যে একটা ফাঁদ হলো ষড়যন্ত্র তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বিপ্লব হলো কৃত্রিমভাবে তৈরি হওয়া একটা বিকৃত সন্তান। আর গেরিলা দলগুলো (যাদের আমরা বলতে পারি এই বিপ্লবের বীজ) হলো বাইরের মানুষ, ষড়যন্ত্রকারী, রাজনৈতিক জঙ্গি—সোজা কথায়, এরা আসল বা মানসিক দিক থেকে ভিনদেশি। এরা সমাজ থেকে আলাদা থেকে নিজেদের কোনো অন্ধকার আর অশুভ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সমাজটাকে ব্যবহার করে। আর দ্বিতীয় ভুল ধারণাটি হলো 'মেথডস ফ্যালাসি', যেটা অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমেরিকান সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল। এটা হলো সেই পুরনো আমলের ভাবনা যে, গেরিলা যুদ্ধ শুধুই কিছু কৌশল আর কায়দা-কানুনের ব্যাপার। যেকোনো অনিয়মিত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যার দরকার হবে, সেই এই কৌশলগুলো কাজে লাগাতে পারবে।

প্রথম ধারণাটা একই সাথে বোকামিপূর্ণ আর ধুরন্ধর। পশ্চিমা লিবারেলিজম আর গণতন্ত্রের (মানে বহুদলীয় নির্বাচন) আসলে সাধারণ মানুষের ওপর কোনো বিশ্বাস নেই। তারা চুপিচুপি ধরে নেয় যে, সাধারণ মানুষ হলো বোকা, মূর্খ আর সেকেলে। তাদের নিজেদের কোনো চিন্তা করার ক্ষমতা নেই, আর বিপ্লবী যুদ্ধ চালানোর মতো ইচ্ছাশক্তি বা যোগ্যতা তো তাদের আছেই না। তাহলে, যে বিপ্লবটা চোখের সামনে ঘটছে, সেটা নিশ্চয়ই বাইরের কোনো লোকের কারসাজি। গেরিলারা নিশ্চয়ই বোকা বানানো হয়েছে, অথবা তারা কোনো বাইরের শক্তির বা অন্তত বাইরের কোনো রাজনৈতিক দর্শনের চালাক এজেন্ট। বিশেষ করে সেই বিপ্লব যদি আমেরিকানদের প্রিয় রাজনৈতিক ঐতিহ্য আর আদর্শের সাথে না মেলে, তাহলে তো কথাই নেই! যেমনটা দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ নিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন: 'আমাদের ওই মানুষগুলোকে (দক্ষিণ ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষদের) বোঝাতে হবে যে— আসলেই কী ঘটছে আর তাদের আমাদের দলে আসাটা কতটা জরুরি। তাহলেই তারা ঠিকটা বেছে নিতে চাইবে...'

বেশিরভাগ আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারক আর কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির নতুন রাজনৈতিক-সামরিক বিশেষজ্ঞরা জেনারেল আইজেনহাওয়ারের চেয়েও অনেক বেশি ধুরন্ধর। তারা বলতে চায়, সমস্ত আধুনিক বিপ্লবগুলো আসলে দুই বিশ্ব ব্যবস্থার লড়াই। একদিকে কমিউনিস্টরা, আর অন্যদিকে আমেরিকান ও তাদের মিত্ররা। আর এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষগুলো শুধুই দাবার ঘুঁটি—যাদের দুই পক্ষই নিজেদের মতো করে চালবে।

আবার যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার হিলসম্যানের 'প্লিয়া ফর রিয়ালিজম ইন সাউথইস্ট এশিয়া' শিরোনামের একটি নিবন্ধে বলেন: 'দক্ষিণ ভিয়েতনামের অবস্থা বুঝতে গেলে শুরুতেই এটা মেনে নিতে হবে যে, আমরা এখানে কোনো যুদ্ধ লড়ছি না। সমস্যাটা সামরিক নয়, বরং রাজনৈতিক। এখানে যুদ্ধের চেয়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডই বেশি চলছে। এক কোটি চল্লিশ লাখ মানুষের এই দেশে কমিউনিস্ট ভিয়েতমিনদের মাত্র ২৮,০০০ থেকে ৩৪,০০০ নিয়মিত গেরিলা সেনা আছে। আর তাদের সাথে আছে ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০ খণ্ডকালীন সাহায্যকারী। তাদের এই অভিযানটা অনেকটা তিরিশের দশকের গ্যাংওয়ার বা আজকের দিনের নিউইয়র্কের কিশোরদের মাস্তানির মতো, কোরিয়া বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো কোনো যুদ্ধ নয়। সত্যি বলতে, এই ধরনের সমস্যা সামলানোর ব্যাপারে সামরিক বাহিনীর চেয়ে এফবিআইয়ের অভিজ্ঞতাই বেশি।'

তবে দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভিয়েতমিনদের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের ব্যাপারটি হিলসম্যান স্বীকার করেছেন: '...ভিয়েতমিনদের বিশাল অংশটাই দক্ষিণ থেকে নেওয়া হয়। তাদের খাবার আর পোশাক দক্ষিণ থেকেই আসে, আর তারা দক্ষিণে 'ট্যাক্স' তোলে যাতে কম্বোডিয়া হয়ে অন্যান্য জিনিসপত্র আনতে পারে।' এই একই বিষয়ে, ১৯৬৪ সালের এপ্রিলে ওয়াল্টার লিপম্যান নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে লিখেছিলেন: 'সত্যিটা হলো, যেটা আমেরিকানদের কাছ থেকে লুকোনো হচ্ছে, সায়গন সরকারের প্রতি সম্ভবত ৩০ শতাংশেরও কম মানুষের সমর্থন আছে এবং তারা (এমনকি দিনের বেলাতেও) দেশের চারভাগের এক ভাগের বেশি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে না।'

তবে এটা বেশ পরিষ্কার যে, যখন চার লাখ সৈন্যের একটা ভিয়েতনামি সেনাবাহিনী, যাদের পেছনে দুটো ডিভিশন আমেরিকান সামরিক 'উপদেষ্টা', যুদ্ধবিমান, জেট বোমারু আর হেলিকপ্টারের এক বিশাল বহর, আর দিনে প্রায় বিশ লাখ ডলারের

মতো টাকার জোগান আছে, তারা একটা বিদ্রোহ সামলাতে পারে না, তখন বুঝতে হবে এর পেছনে 'কিশোরদের মাস্তানি' ছাড়াও আরও বড় কিছু আছে। ভিয়েতমিনদের এই বিদ্রোহ যে আসলে দেশের বাইরে থেকে কলকাঠি নাড়া একটা চরমপন্থী সংখ্যালঘুর কাজ, এই ভুল ধারণাটা এখনো রয়ে গেছে। আর ওয়াশিংটন এই ধারণাটা জিইয়ে রাখছে এমন কিছু কারণে, যা আমরা পরের অধ্যায়গুলোতে খুঁটিয়ে দেখব।

যাইহোক, গেরিলাদের বিরুদ্ধে কি গেরিলা কৌশল কাজে লাগানো যায়? এর সোজা উত্তর হলো, না। এমনটা ভাবা মানেই সেই 'মেথডস ফ্যালাসি' বা পদ্ধতির ভুল ধারণায় পা দেওয়া। জঙ্গলের ছাপ দেওয়া পোশাক পরলেই একজন আমেরিকান মেরিন সেনা গেরিলা হয়ে যায় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর তার পরের প্রতিটি সংঘাতের অভিজ্ঞতাই আমাদের পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, কমান্ডো সেনারা গেরিলা নয়। এমনকি এখনকার আরও আধুনিক স্কুলে তৈরি হওয়া তথাকথিত 'কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি' বা বিদ্রোহ দমনকারী বাহিনীগুলোকেও গেরিলা বলা যায় না। যদিও তারা গেরিলা যোদ্ধাদের কিছু চেনা কৌশল কাজে লাগাতে পারে, যেমন—রাতের বেলা ঝটিকা আক্রমণ, ওঁত পেতে থাকা, সামরিক ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এই কৌশলগুলো যুদ্ধের মতোই পুরনো। কে জানে, হয়তো আদিম ব্রিটিশরাও সিজারের লিজিয়নদের বিরুদ্ধে এগুলো কাজে লাগিয়েছিল। কলম্বিয়ান জঙ্গলের আদিবাসীরা আর এখনো টিকে থাকা নিউ গিনির মাথা শিকারিরাও হয়তো এই কৌশলগুলোই ব্যবহার করে।

কিন্তু মাথা শিকারিরা তো আর গেরিলা নয়! এই দুইয়ের মধ্যে তফাতটা বেশ সোজা। আমরা যখন একজন গেরিলা যোদ্ধার কথা বলি, তখন আমরা আসলে একজন রাজনৈতিক কর্মীর কথা বলি। সে একজন সশস্ত্র সাধারণ মানুষ, যার আসল অস্ত্র তার রাইফেল বা চাপাতি নয়, বরং সেই সমাজ বা দেশের সাথে তার সম্পর্ক, যার ভেতরে আর যার জন্য সে লড়াই করছে। ইনসার্জেন্সি বা গেরিলা যুদ্ধ হলো সমাজ বা রাজনীতির আমূল পরিবর্তনের একটা মাধ্যম। এটা বিপ্লবের মুখ আর ডান হাত। আর কাউন্টার-ইনসার্জেন্সি হলো বিপ্লব ঠেকানোর একটা উপায়, মানে প্রতিবিপ্লব। এই দুটো একটা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, আর ওপর ওপর মিল থাকলেও এদের বা এদের যারা চালায়, তাদের এক করে ফেলাটা ঠিক হবে না।

এই লড়াইয়ের রাজনৈতিক ধরন, দুই পক্ষের হাতে থাকা রসদের আকাশ-পাতাল

তফাত। আর সবচেয়ে বড় কথা, তাদের লক্ষ্যের পুরোপুরি উল্টোমুখী হওয়ার কারণে একজন গেরিলার হাতে থাকা সবচেয়ে কাজের কৌশলগুলো তাকে আটকানোর চেষ্টা করা সেনাবাহিনীর হাতে থাকে না। একটা সেনাবাহিনীর সামনে অনেক কিছুর সমীকরণ থাকলেও একজন গেরিলার থাকে তার দারিদ্র্যের স্বাধীনতা। তার নিজের বলতে শুধু একটা রাইফেল আর পরনের শার্টটাই থাকে। তার নিজের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই রক্ষা করার নেই। তার কোনো জায়গা দখল করার নেই, বিশাল আর জটিল কোনো সামরিক কাঠামো চালানোর নেই, যুদ্ধে ঝুঁকি নেওয়ার জন্যক কোনো ট্যাংক নেই, অবরোধের শিকার হওয়ার মতো কোনো ঘাঁটি নেই, বিমান হামলার শিকার হওয়ার মতো কোনো কিছু বা নিজের কোনো বিমান নেই যা ভূপাতিত করা যেতে পারে, বোমা ফেলার মতো কোনো বিশাল ডিভিশন নেই, অতর্কিত হামলার শিকার হওয়ার মতো কোনো মোটর কনভয় নেই, এমনকি এমন কোনো ঘাঁটি বা ডিপোও নেই— যা সে এক ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে যেতে পারে না। যখন জেতার কোনো আশা থাকে না, তখন সে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পালানোর সুযোগ নিতে পারে। আর যখন নড়াচড়া করাটা নিরাপদ নয়, তখন সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়েও থাকতে পারে। সবশেষে, সে সবসময়ই সাধারণ মানুষের মাঝে মিশে যেতে পারে। মাও সে তুংয়ের সেই বিখ্যাত রূপকটা ধার করে বলা যায়, সমুদ্রের মাঝে গেরিলা একটা মাছের মতোই সাঁতার কাটে।

এতক্ষণে এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে, এই পুরো লড়াইয়ের চাবিকাঠি হলো সাধারণ মানুষ। সত্যি বলতে, পশ্চিমা বিশ্লেষকরা এই ব্যাপারটা মেনে নিতে না চাইলেও—সাধারণ মানুষই কিন্তু আসল লড়াইটা লড়ে। একজন গেরিলা সাধারণ বেসামরিক মানুষের সমর্থন নিয়েই লড়াই করে। এই সাধারণ মানুষই হলো তার ছদ্মবেশ, তার রসদ জোগাড় করার জায়গা, তার নিয়োগের অফিস, তার যোগাযোগের জাল, আর তার দক্ষ ও সবজান্তা গোয়েন্দা সংস্থা। সাধারণ মানুষের সম্মতি আর সক্রিয় সাহায্য ছাড়া একজন গেরিলা কেবলই একজন ডাকাত।

এখানে আবার সেই জরুরি প্রশ্নটা চলে আসে, যার ওপর ভিত্তি করেই দুই পক্ষের কৌশল আর রণকৌশল তৈরি হয়।

একজন গেরিলা যোদ্ধা মূলত একজন প্রচারক, একজন প্ররোচনাকারী, বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া একজন মানুষ, যে কিনা লড়াইটাকেই—অর্থাৎ সত্যিকারের শারীরিক সংঘাতটাকেই একটা প্রচারণা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। তার প্রথম লক্ষ্য হলো বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষা, আর তারপর সাধারণ মানুষের

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্য ওয়ার অফ দ্য ফ্লি। রাজনৈতিক আর সামরিক লক্ষ্য। ভেঙে পড়ার মতো একটা পরিবেশ তৈরি করা। বিদ্রোহী বাহিনীর সংগঠন। গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে গুয়েভারার কথা।

শত্রু যখন এগোয়, আমরা তখন পিছু হটি। শত্রু যখন তাঁবু গাড়ে, আমরা তাদের জ্বালাতন করি। শত্রু যখন ক্লান্ত হয়, আমরা হামলা চালাই। শত্রু যখন পালায়, আমরা তাড়া করি।

- -সিলেক্টেড মিলিটারি রাইটিংস অফ মাও সে তুং

মাও সে তুং এখানে গেরিলা কৌশল নিয়ে যা বলেছেন, তা আসলে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার একটা চাবিকাঠি। এই একই জিনিস কেবল যুদ্ধেই নয়, কূটনীতিতেও দেখতে পাওয়া যায়। সোভিয়েত নীতিনির্ধারকরা চীনাদের এই শিক্ষাটা বেশ ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছে। আর তারা এটা এমন অনেক জায়গায় কাজে লাগায়, যার সাথে গেরিলা যুদ্ধের কোনো সম্পর্কই নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন এর একটা জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ, আর কিউবায় সোভিয়েত মিসাইল ঘাঁটি বানানোটা হলো আরেকটা।

কিন্তু কেনই বা করবে না? শত্রু যখন দুর্বল তখন তাকে আঘাত করা, সে যখন শক্তিশালী তখন তাকে এড়িয়ে চলা, সে যখন পিছু হটে তখন আক্রমণ করা, আর সে যখন এগোয় তখন তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা—এগুলো তো একেবারে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান। এর মধ্যে এমন কোনো নতুনত্ব নেই—যার জন্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী শিবির খুব একটা বাহবা দাবি করতে পারে।

তবে এখানে নতুনত্বটা কোথায়? মাও হলেন সেই মানুষ— যিনি এই ধারণাটা প্রচার করেছেন, আর দীর্ঘ চীনা বিপ্লব ছিল এর প্রথম পরীক্ষাগার। নতুনত্বটা হলো,

কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করার জন্য খুব ভেবেচিন্তে আর ইচ্ছে করে গেরিলা যুদ্ধের কৌশলগুলো কাজে লাগানো। এই যুদ্ধে সরাসরি জয়ের কোনো তাড়া থাকে না, শুধু বিপ্লবীদের টিকে থাকতে হয়। মজার ব্যাপার হলো, চীনাদের বদলে কমিউনিস্ট-বিরোধী কিউবানরাই সামরিক কাজ দিয়ে কীভাবে রাজনৈতিক লক্ষ্য হাসিল করা যায়, তার সবচেয়ে ভালো উদাহরণটা তৈরি করেছিল। সেই যুদ্ধে এমন খুব কম লড়াই-ই ছিল—যেগুলোকে সামরিক কর্তারা টুকটাক গোলাগুলির চেয়ে বেশি কিছু বলবেন। তবুও সেই যুদ্ধে সরকার এমনভাবে ভেঙে পড়েছিল, যেন যুদ্ধের ময়দানে আস্ত একটা সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে।

এর পেছনের কারণটা সামরিক কর্তাদের অবাক করলেও ব্যাপারটা আসলে খুব সোজা। যে গেরিলারা নিজেদের কাজ বোঝে আর যাদের পেছনে সাধারণ মানুষের সমর্থন আছে—বেশিরভাগ সরকারের কাছেই তাদের থামানোর মতো কোনো উপায় থাকে না। অন্যদিকে, খুব কম সরকারই গেরিলা যুদ্ধের রাজনৈতিক, মানসিক আর অর্থনৈতিক চাপ সহ্য করতে পারে, তা তারা সামরিক দিক দিয়ে যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

সাধারণত, সব যুদ্ধেই মূল সমস্যাটা একই থাকে: নিজের শক্তি কাজে লাগিয়ে কীভাবে শত্রুর দুর্বলতায় আঘাত হানা যায় আর তাকে হারানো যায়। দেশের ভেতরের কোনো যুদ্ধে সরকারের শক্তির জায়গাটা হলো তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনী, বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার আর অঢেল সম্পদ। আর তাদের দুর্বলতাগুলো হলো সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক। কারণ, অর্থনীতি একটা বড় সম্পদ হলেও, নানা দিক দিয়ে এটা বেশ নড়বড়ে। এটা যেমন সামরিক লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, তেমনি মানসিক লক্ষ্যবস্তুও হতে পারে।

যেমনটা আমি আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বিপ্লবী যুদ্ধের মূল অস্ত্র, মানে এই ধরনের নাশকতার সামনে বেশ দুর্বল। এসব দেশের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ হওয়া সমাজ আর বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোর কারণে সবসময় একটা রাজনৈতিক আর সামাজিক অসন্তোষ লেগেই থাকে। আর এসবের ফায়দা তোলা বেশ সহজ। দেশের আইনকানুনগুলোও আরেকটা বাধা, আর কখনো কখনো তো এগুলো একেবারে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

ফুলগেনসিও বাতিস্তার পতন এই কারণে হয়নি যে তিনি একজন স্বৈরশাসক ছিলেন। তিনি এমন একটা দেশে ছিলেন, যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল। সেই দেশটা এমন